অধ্যায় ৬

তরঙ্গ ও শব্দ

অধ্যায় ৬ তরঙ্গ ও শব্দ

এই অধ্যায়ে নিচের বিষয়গুলো আলোচনা করা হয়েছে:

- ☑ কম্পন বা স্পন্দন
- ☑ তরঙ্গের ধারণা
- ☑ তরঙ্গের প্রকারভেদ
- ☑ তরঙ্গ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন রাশি
- ☑ শব্দ ও এর গতি

6.1 সরল স্পন্দন গতি

আগের শ্রেণিতে আমরা একটি বিশেষ ধরনের গতির কথা জেনেছিলাম, সেটার নাম পর্যাবৃত্ত গতি (Periodic Motion), যেখানে গতিশীল বস্তুটি একই স্থানে বারবার ফিরে এসে তার গতির পুনরাবৃত্তি করতে থাকে। সুতায় বেঁধে একটা পাথরকে ডানে-বাঁয়ে দুলতে দিলে সেটি হবে পর্যাবৃত্ত গতির একটি উদাহরণ, কারণ পাথরটা যেখান থেকে শুরু করে আবার সেখানে বারবার ফিরে আসে। সত্যি কথা বলতে কি, যদি ঘর্ষণ বা অন্য কোনোভাবে শক্তি ক্ষয় না হতো তাহলে পাথরটা অনন্ত কাল একইভাবে দুলতে থাকত। এই ধরনের গতিতে পাথরটির গতির পুনরাবৃত্তি হতে থাকে কারণ পাথরটির শক্তি ক্রমাগত বিভবশক্তি থেকে গতিশক্তি এবং গতিশক্তি থেকে বিভবশক্তিতে রূপান্তরিত হতে থাকে। প্রথমে পাথরটি ঝুলিয়ে দেয়ার পর সেটি স্থির অবস্থায় ছিল, এটাকে সাম্য অবস্থা বলে। সাম্য অবস্থায় পাথরটির মাঝে বিভবশক্তি বা গতিশক্তি কোনোটাই নেই। এখন পাথরটিকে টেনে একপাশে একটু সরিয়ে নিলে সেটি একটু উপরে উঠে যায় বলে তার ভেতরে বিভবশক্তি সৃষ্টি হয়। এবারে পাথরটি ছেড়ে দিলে সুতা দিয়ে বাঁধা

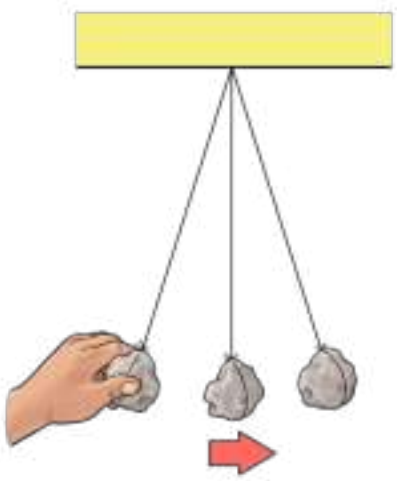

একটা ছোটোপাথরকে সুতায় বেঁধে টেনে একপাশে নিয়ে ছেড়ে দিলে সেটি বিভবশক্তি এবং গতিশক্তির মাঝে রূপান্তরিত হয়ে দুলতে থাকে।

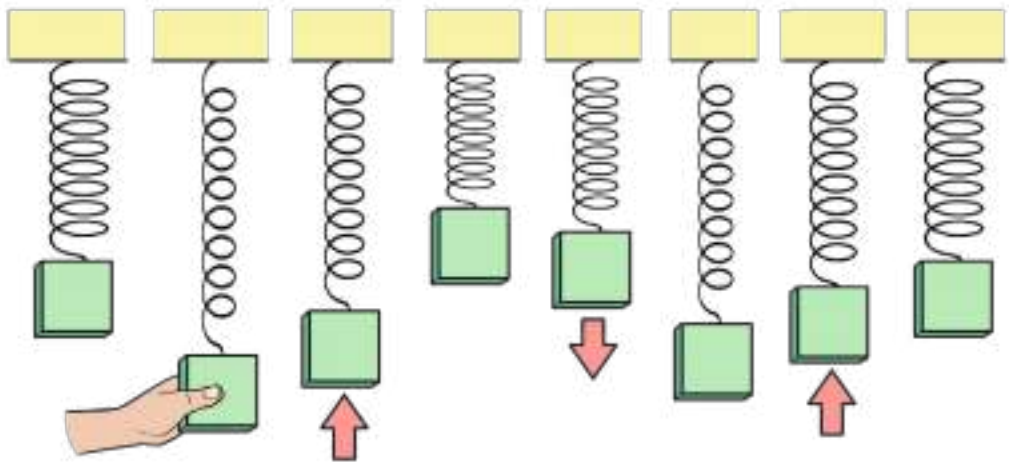

স্বাভাবিক ভাবে স্প্রিং থেকে ঝোলানো বস্তুটির অবস্থা হচ্ছে স্থিতাবস্থা। বস্তুটিকে টেনে নিচে নামিয়ে আনা হলে তার ভেতরে বিভবশক্তি জমা হয়। এটাকে ছেড়ে দিলে সেটি উপরে নিচে স্পন্দিত হতে শুরু করে। প্রথমে বিভবশক্তি গতি শক্তিতে রূপান্তরিত হয়, সেটি স্প্রিংকে সংকুচিত করে বিভবশক্তিতে রূপান্তরিত হয়। তারপর আবার বিভবশক্তি গতি শক্তিতে রূপান্তরিত হয় এভাবে স্প্রিংটি সংকুচিত এবং প্রসারিত হয়ে স্পন্দিত হতে থাকে।

বলে সরাসরি নিচে নামতে পারে না, তাই সামনের দিকে এগিয়ে সর্বনিম্ন স্থানে পৌঁছাতে চায়, তখন বিভব শক্তি কমে সেটি গতিশক্তিতে রূপান্তরিত হতে থাকে। যখন সেটি সবচেয়ে নিচে নেমে আসে—অর্থাৎ পূর্বের সাম্য অবস্থার অবস্থানে আসে তখন তার ভেতরে কোনো বিভব শক্তি থাকে না, কিন্তু পুরো শক্তিটাই গতি শক্তিতে রূপান্তরিত হওয়ার কারণে সবচেয়ে দ্রুত গতিতে যেতে থাকে। যেহেতু এখন পাথরটির মাঝে গতিশক্তি সৃষ্টি হয়েছে আমরা এখন আর এই অবস্থানকে সাম্য অবস্থা বলতে পারব না। এই গতিশক্তির কারণে পাথরটি অন্যপাশে উপরে উঠতে থাকে এবং ধীরে ধীরে তার গতিশক্তি কমতে থাকে। যখন এটি তার সর্বোচ্চ অবস্থানে পৌঁছায় তখন সেটি থেমে যায় বলে তার ভেতরে আর কোনো গতিশক্তি থাকে না, পুরোটাই বিভব শক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে যায়। পাথরটা তখন দিক পরিবর্তন করে ধীরে ধীরে উল্টোদিকে গতিশীল হতে থাকে এবং এভাবে পুরো গতিচক্রের পুনরাবৃত্তি হতে থাকে, অর্থাৎ বিভব শক্তি এবং গতি শক্তির মাঝে শক্তির রূপান্তর হতে থাকে। এই ধরনের গতিকে সরল স্পন্দন গতি (Simple Harmonic Motion) বলে। পৃথিবীতে যত ধরনের গতি আছে তাদের ভেতর এটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গতির মাঝে একটি।

একইভাবে একটা স্প্রিংয়ের সঙ্গে একটা ভর যুক্ত করে সেটাকে নিচে টেনে ছেড়ে দিলে যখন সেটা উপর-নিচ করতে থাকে, সেটিও এই সরল স্পন্দন গতির উদাহরণ। স্প্রিংটিকে তার সাম্য অবস্থা থেকে টেনে লম্বা করে যখন ভরটিকে সবচেয়ে নিচের অবস্থানে নামিয়ে আনা হয় তখন তার ভেতরে একটা বিভব শক্তির সৃষ্টি হয়। ভরটিকে ছেড়ে দিলে এই বিভব শক্তি গতিশক্তিতে রূপান্তরিত হতে থাকে এবং

আগের উদাহরণের মতো গতিশক্তিটি সর্বোচ্চ মানে পৌঁছানোর পর পুরোটাই বিভবশক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে যায়। স্প্রিংটি যখন তার সাম্য অবস্থা থেকে প্রসারিত এবং সংকুচিত হয়, এই দুই অবস্থাতেই তার ভেতরে বিভব শক্তির সৃষ্টি হয়। এভাবে ছবিতে দেখানো উপায়ে ভরটি বিভব শক্তি এবং গতি শক্তির মাঝে রূপান্তরিত হয়ে স্পন্দিত হতে থাকে।

সরল স্পন্দন গতিতে গতিশীল বস্তু যখন একদিকে সর্বোচ্চ দূরত্বে যায়, সাম্যাবস্থা থেকে তার সেই দূরত্বকে বলে বিস্তার। সরল স্পন্দন গতির দোলনকালটি একটি নির্দিষ্ট অবস্থার জন্য সব সময় নির্দিষ্ট থাকে, তাকে বাড়ানো বা কমানো যায় না। দোলন কাল পরিবর্তন করতে হলে সেই নির্দিষ্ট অবস্থার পরিবর্তন করতে হয়। উপরের শ্রেণিতে তোমরা যখন এই বিষয়ে আরও জানবে তখন দেখবে যে, গাণিতিকভাবে প্রমাণ করা যায় l দৈর্ঘ্যের একটি সরল দোলকের জন্য পর্যায়কাল T হলে:

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$$

যেখানে g হচ্ছে মাধ্যাকর্ষণজনিত ত্বরণ। এই সূত্রটি দেখে তুমি বলতে পারবে, শুধু সুতার দৈর্ঘ্যের পরিবর্তন করলেই তুমি দোলনকালের পরিবর্তন করতে পারবে।

6.2 তরঙ্গের ধারণা

তোমরা সবাই পানিতে ঢেউ সৃষ্টি হতে দেখেছ। পুকরের পানিতে একটা ঢিল ছুড়লে যেখানে ঢিলটি পড়ে সেই বিন্দু থেকে বৃত্তাকারে একটি তরঙ্গ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। নদী দিয়ে একটা লঞ্চ গেলে তার ঢেউ নদী অতিক্রম করে একটু পরে তীরে এসে আঘাত করে। কোথাও একটা দড়ি বেঁধে দড়ির অন্য মাথায় একটা ঝাঁকুনি দিলে দড়ির একটা ঢেউকে দড়ি বেয়ে যেতে দেখবে। একটা লম্বা স্প্রিং টান টান করে রেখে তার এক মাথা খানিকটা সংকুচিত করে ছেড়ে দিলে তুমি সেই সংকোচনকে স্প্রিংয়ের ভেতর দিয়ে এগিয়ে যেতে দেখবে।

পুকুরে ঢিল ছুড়লে পানির তরঙ্গ বৃত্তাকারে ছড়িয়ে পড়ে।

এর সবগুলোই এক ধরনের তরঙ্গ, এবং প্রতিটি উদাহরণের বেলায় আমরা দেখেছি কোনো এক ধরনের শক্তি প্রয়োগ করে একটি তরঙ্গ সৃষ্টি করা হয় এবং সেই তরঙ্গটি একটি মাধ্যমের ভেতর দিয়ে এক স্থান থেকে অন্যস্থানে সেই শক্তিটুকু বহন করে নিয়ে যায়। তবে তরঙ্গের বেলায় যেটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সেটি হচ্ছে, যদিও মাধ্যমটি তরঙ্গের মাধ্যমে শক্তিকে একস্থান থেকে অন্যস্থানে নিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু

এই প্রক্রিয়ায় মাধ্যমটি কিন্তু তার স্থান পরিবর্তন করছে না। আমাদের উদাহরণের দড়ি, পানি কিংবা স্প্রিং কোনোটাই কিন্তু নিজের জায়গা ছেড়ে যাচ্ছে না অথচ তার ভেতর দিয়ে তরঙ্গের স্পন্দন আরেক মাথায় পৌঁছে যাচ্ছে। আমরা সবাই শব্দের কথা জানি, শব্দ আমরা চোখে দেখতে পাই না কিন্তু সেটিও আসলে এক ধরনের তরঙ্গ এবং সেটিও বাতাসকে মাধ্যমে হিসেবে ব্যবহার করে একস্থান থেকে অন্য স্থানে পৌঁছায়, কিন্তু বাতাস তার স্থান পরিবর্তন করে না।

» তরঙ্গ হলো মাধ্যমের এক স্থান থেকে অন্য স্থানে শক্তি পাঠানোর প্রক্রিয়া, যেখানে মাধ্যমের বিভিন্ন অংশ নিজের অবস্থানে স্পন্দিত হয়ে শক্তিটুকু এগিয়ে দেয়, কিন্তু মাধ্যম নিজে তার অবস্থান ছেড়ে এগিয়ে যায় না।

6.2.1 তরঙ্গ ও সরল স্পন্দন গতি

তোমরা যারা পুকুরে ঢিল ছুড়ে পানিতে ঢেউ সৃষ্টি করেছ তারা তরঙ্গের মাধ্যমে শক্তি স্থানান্তরের বিষয়টা আরও ভালোভাবে বুঝতে পারবে। পুকুরের পাড় থেকে আমরা যখন ঢিল ছুড়ে দেই, তখন ঢিলটি যেহেতু একটি গতিতে ছুটে যায় কাজেই তার একটি গতিশক্তি থাকে। এই শক্তি নিয়ে ঢিলটি যখন পানির পৃষ্ঠে আছড়ে পড়ে, তখন ঐ স্থানের পানির কণাগুলোতে সেই শক্তি স্থানান্তরিত হয়ে সেখানে একটা স্পন্দনের সৃষ্টি হয়। সেই স্পন্দনটি তার পাশের পানির কণাগুলোতে একটি স্পন্দন তৈরি করে, যেটি আবার তার পাশের কণাগুলোতে স্পন্দন তৈরি করে। এভাবে স্পন্দনটি ছড়িয়ে পড়তে থাকে এবং আমরা দেখতে পাই, কেন্দ্র থেকে বৃত্তের মতো একটি ঢেউ চারপাশে ছড়িয়ে পড়ছে। যদি পুকুরে কোনো কচুরিপানা ভেসে থাকে তাহলে দেখবে তার নিচে দিয়ে ঢেউটি যাওয়ার সময় কচুরিপানাটি নিজের জায়গাতেই উপরে নিচে করেছে কিন্তু ঢেউয়ের সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে আসেনি। অর্থাৎ, মাধ্যম নিজে সরেনি, শুধু নিজের স্থানে স্পন্দিত হয়ে তরঙ্গটিকে এগিয়ে নিয়ে গেছে , অর্থাৎ শক্তিটি পৌঁছে দিয়েছে।

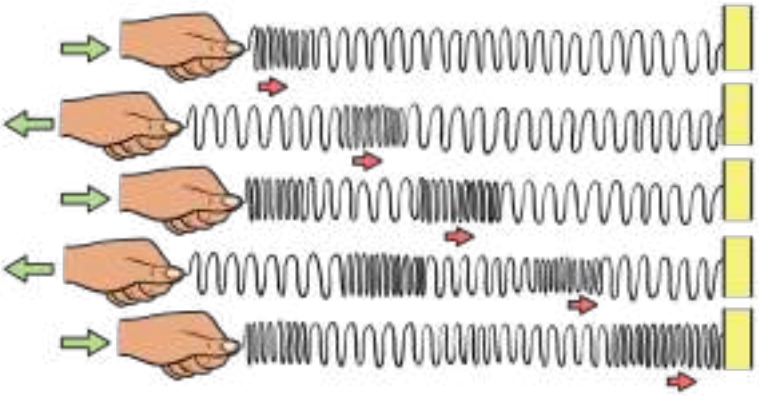

স্প্রিংয়ের একপ্রান্ত প্রসারিত এবং সংকুচিত করে তার ভেতর একটি অনুদৈর্ঘ্য তরঙ্গ তৈরি করা হয়েছে।

তোমরা এবারে নিশ্চয়ই তরঙ্গের সঙ্গে সরল স্পন্দন গতির সম্পর্কটা বুঝতে পারবে। যখন কোনো মাধ্যমের ভেতর দিয়ে একটি তরঙ্গ এগিয়ে যায় তখন তুমি যদি সেই মাধ্যমের কোনো একটি নির্দিষ্ট

বিন্দুর দিকে তাকিয়ে থাকো তাহলে তুমি সেই বিন্দুটির একটি সরল স্পন্দন গতি হতে দেখবে। মাধ্যমের একটি বিন্দুর সরল স্পন্দন গতি হওয়ার সময়ে সেটি তার পাশের বিন্দুতে সরল স্পন্দন গতি সৃষ্টি করে এবং এভাবে একটি তরঙ্গ এগিয়ে যায়। সরল স্পন্দন গতি তরঙ্গ নয় কিন্তু তরঙ্গের প্রত্যেকটা বিন্দু আলাদা আলাদাভাবে একটি করে সরল স্পন্দন গতি।

যদিও আমরা তরঙ্গের প্রবাহের বেলায় একটি মাধ্যমের কথা বলেছি, কিন্তু কিছু তরঙ্গ আছে যার প্রবাহের জন্য মাধ্যমের প্রয়োজন হয় না। আলো সেরকম একটি তরঙ্গ, এবং আমরা জানি সূর্য থেকে আলো মহাকাশের ভেতর দিয়ে কোনো মাধ্যম ছাড়াই পৃথিবীতে পৌঁছে যায়। এই অধ্যায়ে আলোচনা করার সময়ে আমরা যে সকল তরঙ্গের মাধ্যমের প্রয়োজন হয় শুধু সেই সকল তরঙ্গের মাঝে আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখব।

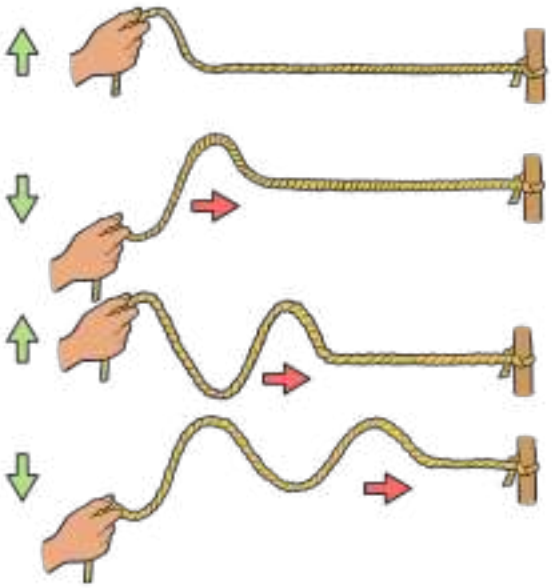

দড়ির একপ্রান্ত উপর-নিচ করে তার ভেতর একটি অনুপ্রস্থ তরঙ্গ তৈরি করা হয়েছে।

6.2.2 তরঙ্গের প্রকারভেদ

তরঙ্গের ব্যাপারে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ যে, এখানে মাধ্যম তার নিজের অবস্থানে থেকেই কম্পনের মাধ্যমে শক্তিকে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে নিয়ে যায়। মাধ্যমের কণাগুলোর দুভাবে কম্পন হতে পারে। লম্বা একটা স্প্রিঙের একপ্রান্ত কোনো একটা জায়গায় শক্ত করে আটকে নিয়ে অন্য প্রান্তটি নিয়মিত সময়ের ব্যবধানে সামনে পিছনে করলে তুমি দেখবে সংকোচন ও প্রসারণের একটি তরঙ্গ স্প্রিঙের ভেতর দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। এই সংকোচন ও প্রসারণ হচ্ছে স্প্রিঙের স্পন্দন। একটু মনোযোগ দিয়ে খেয়াল করে দেখো, এখানে তরঙ্গটি যেদিকে গেছে, স্প্রিঙের স্পন্দন বা কম্পনও সেই রেখা বরাবরই হয়েছে। এই ধরনের তরঙ্গকে 'অনুদৈর্ঘ্য তরঙ্গ' (longitudinal wave) বলা হয়। স্প্রিঙের তরঙ্গের মতো শব্দও একটি অনুদৈর্ঘ্য তরঙ্গ, বাতাসে প্রসারণ ও সংকোচন করে শব্দ এগিয়ে যায়।

আবার মোটামুটিভাবে লম্বা একটা দড়ির একপ্রান্ত যদি কঠিন কোনো কিছুতে টানটান করে অন্যপ্রান্ত নিয়মিত সময়ের ব্যবধানে উপরে নিচে কর তাহলে কী হবে? এবারেও তুমি একটা তরঙ্গকে দড়ির ভেতর দিয়ে এগিয়ে যেতে দেখবে। তবে এবারে দড়িটি ঢেউয়ের মতো উপরে উঠে এবং নিচে নেমে তরঙ্গটিকে এগিয়ে নেবে। একটু মনোযোগ দিয়ে খেয়াল করে দেখো, এখানে তরঙ্গটি যেদিকে গেছে, দড়িটির স্পন্দন বা কম্পন হয়েছে তার সাথে লম্ব ভাবে। এই ধরনের তরঙ্গকে 'অনুপ্রস্থ তরঙ্গ' বা (transverse wave) বলা হয়। পানির ঢেউ একটি অনুপ্রস্থ তরঙ্গ। আমরা আলো দেখতে পেলেও

আলোর তরঙ্গটি দেখতে পাই না, সেটিও একধরনের অনুপ্রস্থ তরঙ্গ। তোমাদের আশপাশের যে নানা ধরনের তরঙ্গ রয়েছে তুমি কি তাদের ভেতর থেকে অনুপ্রস্থ আর অনুদৈর্ঘ্য তরঙ্গগুলো আলাদা করতে পারবে?

» একটি তরঙ্গের মাধ্যম যখন তরঙ্গের দিকে স্পন্দিত হয়ে এগিয়ে যায় তখন তাকে অনুদৈর্ঘ্য তরঙ্গ বলে। তরঙ্গের মাধ্যম যখন তরঙ্গের সঙ্গে লম্বভাবে স্পন্দিত হয়ে এগিয়ে যায় তখন তাকে অনুপ্রস্থ তরঙ্গ বলে।

6.2.3 তরঙ্গের সঙ্গে যুক্ত কিছু রাশি

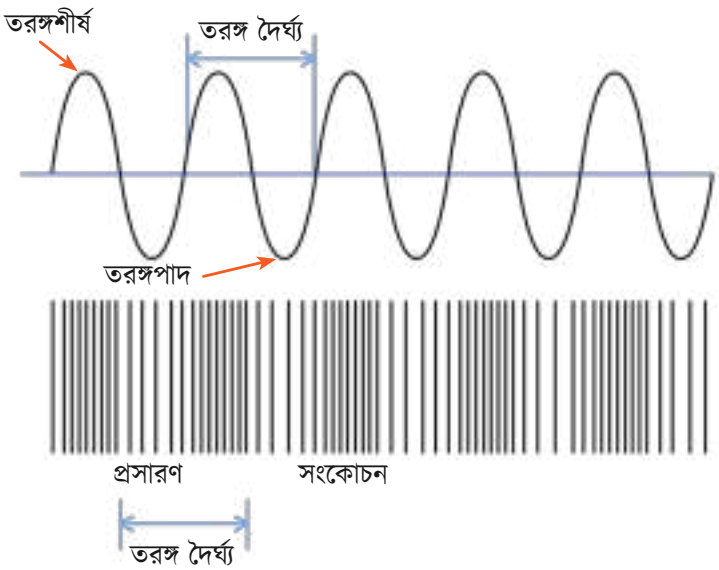

তরঙ্গশীর্ষের শুরু থেকে ঠিক পরের তরঙ্গপাদের শেষ অংশটাকে বলে 'তরঙ্গদৈর্ঘ্য'

পাশের ছবিতে একটি অনুপ্রস্থ এবং একটি অনুদৈর্ঘ্য তরঙ্গের ছবি দেওয়া হয়েছে। তরঙ্গ দুটি দেখতে একেবারে ভিন্ন হলেও তাদের ভেতর একটি বড়ো মিল রয়েছে, সেটি হচ্ছে দুটি তরঙ্গেই তাদের স্পন্দনটির পুনরাবৃত্তি ঘটছে। অনুদৈর্ঘ্য তরঙ্গের ক্ষেত্রে কম্পন বা স্পন্দনের যে অংশ সাম্য অবস্থার সবচেয়ে উপরে থাকে তাকে বলে তরঙ্গশীর্ষ। আবার যে অংশ সাম্য অবস্থার সবচেয়ে নিচে থাকে তাকে বলে তরঙ্গপাদ। একইভাবে অনুদৈর্ঘ্য তরঙের বেলায় কম্পন বা স্পন্দনের যে অংশ সাম্য অবস্থা থেকে সবচেয়ে বেশি সংকুচিত থাকে তাকে বলে তরঙ্গশীর্ষ। আবার যে অংশ সাম্য অবস্থা থেকে সবচেয়ে বেশি প্রসারিত থাকে তাকে বলে তরঙ্গপাদ। একটা তরঙ্গশীর্ষ থেকে শুরু থেকে ঠিক পরের তরঙ্গশীর্ষের দৈর্ঘ্য বা একটা তরঙ্গপাদ থেকে শুরু থেকে ঠিক পরের তরঙ্গপাদের দৈর্ঘকে বলে 'তরঙ্গদৈর্ঘ্য' (wavelength)। এটি যেহেতু আসলে একটি দৈর্ঘ্য, তাই একে মাপা হয় সেন্টিমিটার কিংবা মিটারে, অর্থাৎ দৈর্ঘ্যের এককে। তরঙ্গদৈর্ঘ্যকে গাণিতিকভাবে প্রকাশের জন্য সাধারণত গ্রিক λ অক্ষরটি ব্যবহৃত হয়, এর উচ্চারণ ল্যাম্বডা।

দড়ি কিংবা পানির ঢেউয়ের ক্ষেত্রে একটা বিষয় নিশ্চয়ই বুঝেছ যে তরঙ্গের মাধ্যমে শক্তিটুকু বয়ে নিতে একটু সময়ের প্রয়োজন। শব্দ কিংবা আলোর বেলায় আমরা বুঝতে পারি না কিন্তু সেখানেও তরঙ্গকে একস্থান থেকে অন্য স্থানে যেতে সময়ের প্রয়োজন হয়। ঠিক এক তরঙ্গদৈর্ঘ্য পরিমাণ দূরত্ব সরতে

যেটুকু সময়ের প্রয়োজন হয় তাকে 'পর্যায়কাল' (period) বলে। এটি যেহেতু একটি সময়, তাই একে মাপা হয় মিনিট কিংবা সেকেন্ডে, অর্থাৎ সময়ের এককে। পর্যায়কালকে গাণিতিকভাবে প্রকাশের জন্য ইংরেজি T অক্ষরটি ব্যবহৃত হয়। আবার, এক সেকেন্ডে যে কয়টা তরঙ্গ একটা নির্দিষ্ট অবস্থান অতিক্রম করে তাকে কম্পাঙ্ক (frequency) বলা হয়। কম্পাঙ্ক গাণিতিকভাবে প্রকাশ করা হয় ইংরেজি f অক্ষরটি দিয়ে, আর একে মাপা হয় হার্টজ (Hertz) এককে। একটি তরঙ্গের কম্পন যত কম তার পর্যায়কাল তত বেশি, কারণ কম্পাঙ্ক হচ্ছে প্রতি সেকেন্ডে পর্যায়কালের সংখ্যা, অর্থাৎ,

$$f = \frac{1}{T}$$

যেহেতু T-এর একক হচ্ছে সেকেন্ড বা s, তাই হার্টজের এককটি আসলে s^{-1} বা 'প্রতি সেকেন্ড' নির্দেশ করে। অর্থাৎ একটি তরঙ্গের কম্পাঙ্ক 100 হার্টজ কথাটির অর্থ হচ্ছে তরঙ্গটির একটি নির্দিষ্ট বিন্দুতে তাকিয়ে থাকলে আমরা তার বিস্তারকে প্রতি সেকেন্ডে 100 বার কম্পিত হতে দেখব।

তোমরা নিশ্চয়ই লক্ষ করেছ যে তরঙ্গের কয়েকটি রাশিমালা আমরা সরল স্পন্দন গতির বেলাতেও ব্যবহার করেছিলাম। তরঙ্গ ও সরল স্পন্দন গতি, দুটিতেই পর্যায়কাল বা দোলনকাল রয়েছে, দুটিতেই আমরা কম্পাঙ্কের ধারণা ব্যবহার করতে পারি, এবং দুটির জন্যই বিস্তার রাশিটি প্রযোজ্য। তবে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য রাশিটি শুধু তরঙ্গের বেলায় প্রযোজ্য সরল স্পন্দন গতির কোনো তরঙ্গ দৈর্ঘ্য নেই। ঠিক একইভাবে তরঙ্গের বেগ বলে একটি রাশিও শুধু তরঙ্গের বেলায় প্রযোজ্য সরল স্পন্দন গতির কোনো বেগ নেই।

এক সেকেন্ডে একটি তরঙ্গ যেটুকু দূরত্ব অতিক্রম করে সেটিই হচ্ছে তার বেগ। যেহেতু একটি তরঙ্গ প্রতি সেকেন্ডে f সংখ্যক তরঙ্গ দৈর্ঘ্য অতিক্রম করে কাজেই তরঙ্গটি প্রতি সেকেন্ডে f দূরত্ব অতিক্রম করে। অর্থাৎ তরঙ্গের বেগ v হচ্ছে,

$$v = f\lambda \text{ m/s}$$

তরঙ্গের বেগ = কম্পাঙ্ক × তরঙ্গদৈর্ঘ্য

যেহেতু নির্দিষ্ট কোনো মাধ্যমে তরঙ্গের বেগ নির্দিষ্ট হয়, কাজেই কম্পাঙ্ক যত বেশি হবে তরঙ্গদৈর্ঘ্য তত কম হবে, আবার তরঙ্গদৈর্ঘ্য যত বেশি হবে কম্পাঙ্ক তত কম হবে। শব্দের কম্পাঙ্ক এর তীক্ষ্ণতা নির্ধারণ করে, আবার আলোর কম্পাঙ্ক আলোর রঙ নির্ধারণ করে। নীল আলোর কম্পাঙ্ক বেশি তাই তার তরঙ্গদৈর্ঘ্য অপেক্ষাকৃত কম, আবার উল্টোদিকে লাল আলোর কম্পাঙ্ক কম কাজেই এর তরঙ্গদৈর্ঘ্য অপেক্ষাকৃত বেশি।

৬.৩ শব্দের উৎপত্তি

ধাতব কোনো পদার্থের তৈরি থালা তোমরা সবাই দেখেছ। এরকম একটি থালা হাত থেকে পড়ে গেলে ঝনঝন করে শব্দ হয়। এরকম একটা থালা খুঁজে হাতে নিয়ে তার এক প্রান্ত শক্ত করে ধরে চামচ দিয়ে মাঝখানে একটা আঘাত দিলে তোমরা একটা ধাতব শব্দ শুনতে পাবে, তখন ভালো করে তাকালে দেখবে থালাটা কাঁপছে। থালার মাঝে হাত দিয়ে কম্পনটি থামিয়ে দিলে দেখবে সঙ্গে সঙ্গে শব্দটিও থেমে গেছে। এখান থেকেই বোঝা যায় যে কম্পনের সাথে শব্দের একটা সম্পর্ক আছে। কথা বলার সময় গলার নিচে হাত দিয়ে স্পর্শ করলে দেখবে সেখানে এক ধরনের কম্পন হয়। এখানে 'স্বরতন্ত্রী' (Vocal Chord) নামে একটা পর্দা কাঁপিয়ে আমরা কথা বলে থাকি। যে কোনো বস্তুর কম্পন থেকেই উৎপন্ন হতে পারে 'শব্দ' যা মানুষ কিংবা অন্যান্য প্রাণী কানের মাধ্যমে অনুভব করে। শব্দ আসলে বস্তুর কম্পন থেকে পার্শ্ববর্তী মাধ্যমে সৃষ্ট অনুদৈর্ঘ্য তরঙ্গ। সব কম্পাঙ্কের শব্দ শোনা যায় না। মানুষের শ্রাব্যতার সীমা 20 হার্টজ থেকে 20,000 হার্টজ, অর্থাৎ মানুষ সাধারণত 20 হার্টজ থেকে 20,000 হার্টজ পর্যন্ত শুনতে পায়। অন্যান্য প্রাণীদের কান এর চেয়েও সংবেদনশীল হতে পারে। 20 হার্টজ থেকেও কম কম্পাঙ্কের কম্পনকে সাবসনিক (subsonic) আর 20000 হার্টজ থেকেও কম কম্পাঙ্কের কম্পনকে আলট্রাসনিক (ultrasonic) কম্পন বলে।

বিড়ালের শ্রাব্যতার সীমা 48 হার্টজ থেকে 85,000 হার্টজ পর্যন্ত!

৬.৫ শব্দের গতি

একটু আগেই আমরা জেনেছি যে তরঙ্গের বেগ আছে। শব্দ যেহেতু একটি তরঙ্গ তাই কোনো নির্দিষ্ট মাধ্যমে শব্দেরও একটি নির্দিষ্ট বেগ রয়েছে। বিভিন্ন মাধ্যমের সংকোচন-প্রসারণ যেহেতু একইভাবে হয় না, তাই মাধ্যমভেদে শব্দের বেগও ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। কঠিন পদার্থের অণুগুলো যেহেতু শক্তভাবে পদার্থের একটি খণ্ড হিসেবে যুক্ত থাকে তাই এক টুকরো কঠিন পদার্থের একপ্রান্তে নাড়ালে সেই কম্পনটি খুব দ্রুত অন্যপ্রান্তে পৌঁছে যায়। সে কারণে কঠিন মাধ্যমে শব্দের বেগ সবচেয়ে বেশি। আবার তরল পদার্থের অণুগুলো একটু ঢিলেঢালাভাবে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত থাকে। তাই তরল পদার্থের একপ্রান্তে সৃষ্ট কম্পন অন্যপ্রান্তে পৌঁছতে একটু দেরী হয়। অর্থাৎ, তরল মাধ্যমে শব্দের বেগ কঠিন মাধ্যমের চেয়ে কম। বায়বীয় পদার্থের অণুগুলো প্রায় মুক্ত অবস্থায় থাকে, বায়বীয় পদার্থের একপ্রান্তে সৃষ্ট সংকোচন-প্রসারণ অন্যপ্রান্তে পৌঁছতে সবচেয়ে বেশি সময় লাগে, তাই বায়বীয় মাধ্যমে শব্দের বেগ সবচেয়ে কম। কাজেই দেখতে পাচ্ছ একই শব্দ ভিন্ন ভিন্ন মাধ্যমে ভিন্ন ভিন্ন বেগে যায়। যেখানে বাতাসে শব্দের বেগ 332 m/s, সেখানে পানিতে শব্দের বেগ প্রায় চারগুণ বেশি, 1481 m/s এবং লোহাতে শব্দের বেগ পানি থেকে প্রায় আরও তিনগুণ বেশি, 5120 m/s!

উদাহরণ : সুর শলাকা দিয়ে একটি নির্দিষ্ট কম্পনের শব্দ তৈরি করা যায়। 830 Hz কম্পাঙ্কের একটি সুরশলাকা কম্পিত করা হলে এই শব্দের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য কত? (ধরে নাও বাতাসে শব্দের বেগ 332 m/s)

সমাধান : এখানে, সুরশলাকার কম্পাঙ্ক f = 830 Hz, আর বাতাসে শব্দের বেগ, v = 332 m/s, বের করতে হবে বাতাসে এই শব্দের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য কত।

শব্দের বেগ যেহেতু $v = f\lambda$ বা $\lambda = v/f$

কাজেই,

$$\lambda = \frac{332}{830} = 0.4m$$

শব্দ যেহেতু তরঙ্গ আকারে সঞ্চালিত এক প্রকার শক্তি, তাই অন্যান্য তরঙ্গের মতো শব্দতরঙ্গও বাধা পেলে আবার উল্টো দিকে ফিরে আসে, অর্থাৎ প্রতিফলিত হয়, এক্ষেত্রে অনেক সময় একই শব্দ আবার শোনা যায়, যাকে বলা হয় প্রতিধ্বনি। এজন্য বড়ো একটি খালি ঘরের মাঝখানে শব্দ করলে একধরনের গমগমে শব্দ শোনা যায়। যথেষ্ট দূরে বড়ো দেয়াল কিংবা পাহাড়ের সামনে শব্দ করলেও অনেক সময় পরিষ্কার প্রতিধ্বনি শোনা যায়। পর্যাপ্ত গভীরতার কুয়ার মুখে শব্দ করলেও প্রতিধ্বনি ঘটতে পারে। প্রতিধনির ক্ষেত্রে শব্দকে উৎস থেকে বাধা পর্যন্ত দূরত্ব একবার যেতে হয়, আবার একই দূরত্ব ফিরে আসতে হয়। অর্থাৎ, উৎস থেকে বাধার মাঝের যে দূরত্ব, এর ঠিক দ্বিগুণ দুরত্ব তাকে অতিক্রম করতে হয়। আমরা যদি মূল শব্দের আর প্রতিধ্বনির মাঝে সময়ের পার্থক্যটুকু সূক্ষ্মভাবে মাপতে পারি, তবে এ থেকেই শব্দের বেগ নির্ণয় করে ফেলা যায়। তাহলে উৎস থেকে বাধাটি d দূরত্বে অবস্থিত হলে এবং শব্দ ও প্রতিধ্বনির মাঝে t পরিমাণ সময়ের পার্থক্য থাকলে লেখা যায় :

$$\text{শব্দের বেগ, } v = \frac{\text{অতিক্রান্ত দূরত্ব}}{\text{প্রয়োজনীয় সময়}} = \frac{\text{উৎস ও বাধার দূরত্বের দ্বিগুণ}}{\text{মূল শব্দ ও প্রতিধ্বনির সময় পার্থক্য}} = \frac{2d}{t}$$

উদাহরণ : মানুষ 0.1 সেকেন্ডের ভেতর আসা দুটি শব্দের মাঝে পার্থক্য করতে পারে না তাই প্রতিধ্বনি শোনার জন্য উৎস থেকে বাধার দূরত্ব কমপক্ষে কত হতে হবে?

সমাধান : শব্দটি কমপক্ষে 0.1 সেকেন্ড পরে প্রতিফলিত হয়ে ফিরে আসতে হবে। শব্দের বেগ 332 m/s ধরে নিলে আমরা বলতে পারি শব্দটিকে 332 x 0.1 = 33.2 m দূরত্ব অতিক্রম করতে হবে। শব্দটিকে যেহেতু উৎস থেকে বাধায় পৌঁছে আবার উৎসে ফিরে আসতে হয়, অর্থাৎ উৎস থেকে বাধার দূরত্বের দ্বিগুণ দূরত্ব অতিক্রম করে কাজেই প্রকৃত দূরত্ব হবে 33.2 m এর অর্ধেক বা 17 মিটারের কাছাকাছি।

আবার, মাধ্যমে শব্দের বেগ যদি আগেই জানা থাকে তাহলে প্রতিফলিত শব্দ কত সময় পরে ফিরে এসেছে সেখান থেকে উৎস থেকে বাধার দূরত্ব $d = vt/2$ বের করা যায়।

$$\text{উৎস থেকে বাধার দূরত্ব} = \frac{\text{মাধ্যমে শব্দের বেগ} \times \text{শব্দ ও প্রতিধ্বনির সময় পার্থক্য}}{2}$$

অর্থাৎ, শব্দের প্রতিধ্বনি থেকে কেবল ঘড়ি ধরে সময়ের পার্থক্য মেপেই আমরা বাধাটি কত দূরে আছে, সেটা বের করে ফেলতে পারব। সত্যি বলতে কি, পানির নিচে চলমান ডুবোজাহাজ ঠিক এই পদ্ধতি ব্যবহার করে বাধা এড়িয়ে চলাচল করে থাকে। যে যন্ত্রে খুব সূক্ষ্মভাবে সময় মেপে এই দূরত্ব নির্ণয় করা হয় তার নাম সোনার (Sonar)। প্রকৃতিতেও বাদুড় এই পদ্ধতি ব্যবহার করে শিকারের দূরত্ব কিংবা সামনে থাকা বাধা কত দূরে আছে, সেটা নির্ণয় করে। সমুদ্রের গভীরতা মাপতেও প্রতিধ্বনির ব্যবহার আছে। বিজ্ঞানীরা একই পদ্ধতিতে মাটির কত নিচে পানির স্তর কিংবা খনিজ পদার্থের স্তর আছে, সেটিও পরিমাপ করে থাকেন।

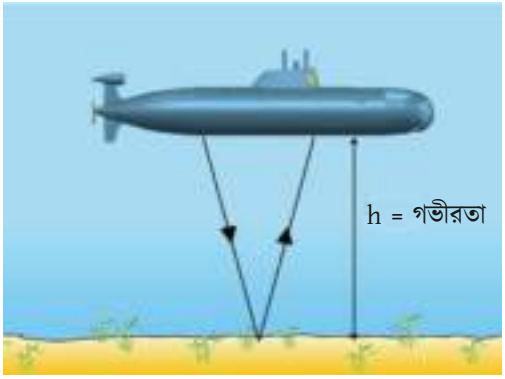

ডুবোজাহাজ প্রতিধ্বনির সময় থেকে গভীরতা পরিমাপ করে।

উদাহরণ : তুমি একটি পাহাড় থেকে কিছুদূরে দাঁড়িয়ে একটি হাততালি দেয়ার ঠিক 6 s পরে আরেকটি হাততালির শব্দ শুনতে পেলে। তুমি পাহাড় থেকে কতদূরে আছ বলতে পারবে? (বাতাসে শব্দের বেগ হিসেবে 332 m/s ব্যবহার করতে পারো।)

সমাধান : এখানে, বাতাসে শব্দের বেগ $v = 332$ m/s আর প্রয়োজনী সময় $t = 6$ s, বের করতে হবে দূরত্ব d কত? আমরা জেনেছি,

$$d = \frac{vt}{2} = \frac{332 \times 6}{2} = 996\ m$$